বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
অষ্টবিংশতিতম খন্ড বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৭

ঋণে নিমগ্ন বাংলার গ্রাম : মুক্তির উপায় কি?

অনুপম সেন*

এক

মাইক্রো ফাইন্যান্স বা মাইক্রো ক্রেডিট নামে যে ব্যবস্থা বাংলাদেশে জন্ম নিয়ে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে, তার ঘোষিত উদ্দেশ্য দারিদ্র্য-বিমোচন, দারিদ্র্যকে চিরতরে উচ্ছেদ করা। ১৯৮০'র দশকের প্রথমার্ধে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে এই তত্ত্ব প্রচার করা হয় যে, গ্রামীণ নারীদের ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করলে তারা বিভিন্ন ধরনের আত্মকর্ম সৃষ্টি করে স্ব-নির্ভর হয়ে দারিদ্র্য-মুক্তি অর্জন করবেন, দেশ থেকে দারিদ্র্যকে নির্মূল করবেন। ১৯৯০ দশক শুরু হওয়ার আগেই গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশে বেশ ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এর শাখা-প্রশাখা গ্রামে-গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। অচিরেই এই ব্যাংক প্রসিদ্ধি লাভ করে দেশে বিদেশে।

কিন্তু তাত্ত্বিক ও বাস্তব উভয় অর্থেই ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্র্য-লাঘব করতে সক্ষম হলেও দারিদ্র্য-বিমোচন করতে অক্ষম। উপরন্তু, ক্ষুদ্রঋণের উপর যদি বর্ধিত হারে সুদ প্রদান করতে হয় এবং তা যদি হয় সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধ্য তা'হলে লাখেও একজনের দারিদ্র্য-মুক্তি ঘটবে কিনা সন্দেহ। ধ্রুপদী (Classical) বা নয়া ধ্রুপদী (New Classical) উভয় তত্ত্বেই সম্পদ বৃদ্ধি করতে হলে আয়ের একটা অংশকে সঞ্চয় করতে হয় পুঁজি সৃষ্টি করার জন্য এবং সেই পুঁজি বিনিয়োগ করতে হয় নতুন সম্পদ সৃষ্টির জন্য; এটি যেমন দেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তেমনি ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু ক্ষুদ্রঋণ ভিত্তিক ব্যবসায়ে পুনর্বিনিয়োগের জন্য পুঁজি সৃষ্টির অবকাশ অতি সামান্যই আছে। তথ্যগতভাবে দেখা গেছে, একটি দেশের বার্ষিক বিনিয়োগ সে দেশের জিডিপির ত্রিশ শতাংশের উপরে নিতে পারলে প্রবৃদ্ধির হার জিডিপির আট শতাংশের উপরে উন্নীত করা সম্ভব হয়, যদি বিনিয়োগকে ফলপ্রসূ করা যায়। ১৯৫০-এর দশক থেকে বার্ষিক বিনিয়োগের হার ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে পঁয়ত্রিশ শতাংশে উন্নীত করার ফলে প্রায় গত এক দশক ধরে চীন দশ শতাংশের কাছাকাছি বার্ষিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে যাচ্ছে। এই অভূতপূর্ব প্রবৃদ্ধির হার অধুনা চীনকে যুক্তরাষ্ট্রের পরে বিশ্বের দ্বিতীয় ধনী দেশে রূপান্তরিত করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশও দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিনিয়োগের হারকে দেশজ উৎপাদনের ত্রিশ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে তার বার্ষিক সঞ্চয়ের হারকে বাড়িয়ে, যা বর্তমানে বিশ শতাংশের কিছুটা উপরে। এই দেশজ সঞ্চয়ই 'পুঁজি' বা 'ক্যাপিটাল' অর্থাৎ বিনিয়োগের উৎস। (এখানে যেমন রয়েছে বেসরকারি তেমন রয়েছে সরকারি সঞ্চয়ও)। বস্তুত পুঁজি বৃদ্ধি ঘটে ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগের মাধ্যমে। এই ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগই দারিদ্র্য-মুক্তির পন্থা বা পথ। কারণ বর্ধিত বিনিয়োগের ফলে বর্ধিত উৎপাদন হয়, আবার বর্ধিত উৎপাদনের ফলে বর্ধিত সঞ্চয় হয় যা সৃষ্টি করে বর্ধিত পুঁজি এবং বিনিয়োগ। এই প্রক্রিয়া চক্রাকারে চলতে থাকে এবং উত্তরোত্তর উৎপন্ন বৃদ্ধি হয়ে দারিদ্র্য-মুক্তির দিকে নিয়ে যায়—কি ব্যক্তিকে, কি দেশকে।

---

*উপাচার্য, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

ক্ষুদ্রঋণকে ক্রমবর্ধমান পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান পুঁজিতে পরিণত করা খুব কঠিন ব্যাপার। কারণ ক্ষুদ্রঋণকে বিনিয়োগের মাধ্যমে অতি ফলপ্রসূ করা হলেও যে উদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয় তার পরিমাণ প্রায়শ এতো সামান্য যে তা থেকে যদি সপ্তাহে সপ্তাহে কিস্তি পরিশোধ করা হয়, তাহলে সঞ্চয়ের জন্য অবশিষ্ট কিছু থাকে না। সাপ্তাহিক কিস্তি প্রদান এতো বাধ্যতামূলক যে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি না হলে পুঁজি হতে তা পরিশোধ করতে হয়। যার ফলে পুঁজি বৃদ্ধির জায়গায় পুঁজি ঋণাত্মক হয়ে পরে। তখন ধার নেওয়া অর্থ বা ঋণ পরিশোধ করার জন্য আরও ঋণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এইভাবে পুঁজি বৃদ্ধির পরিবর্তে পুঁজি হ্রাস হয়। অথচ ক্রমবর্ধমান পুঁজি সঞ্চয় বা Capital Accumulation ছাড়া দেশের দারিদ্র্য বিমোচন যেমন সম্ভব নয় তেমনি ব্যক্তির বা গ্রামীণ জনগণের দারিদ্র্য মুক্তিও সম্ভব নয়।

ক্ষুদ্রঋণ যে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেনি তার কিছু নির্দেশনা পাওয়া যায় 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৯-এ প্রদত্ত তথ্যে। এই সমীক্ষার তথ্যমতে, ২০০৫ সালে বাংলাদেশে চরম দরিদ্র বা Hardcore Poor'দের সংখ্যা ছিল মোট জনগোষ্ঠীর ১৯.৫ শতাংশ। কিন্তু গত অর্থবছরে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩০ শতাংশের কাছাকাছি। দারিদ্র্যের এই পরিমাপে জনপ্রতি প্রতিদিন ২১২২ কিলোক্যালোরির নিচে খাদ্যগ্রহণকে 'অনপেক্ষ' বা Absolute Poverty হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং ১৮০৫ কিলোক্যালোরির নিচে খাদ্যগ্রহণকে বিবেচনা করা হয়েছে 'চরম দারিদ্র্য' বা Hardcore Poverty হিসেবে। বস্তুত যারা ১৮০৫ কিলোক্যালোরি খাদ্যগ্রহণ করে তারা যে কি চরম অপুষ্টির শিকার এবং যথার্থ অর্থে যে মানবসত্তাই বহন করছে না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমরা জানি, ২০০৫ এর পরে ঘটে যাওয়া প্রলয়ংকারী ঝড় সিডর ও তার পরে আইলা বাংলাদেশে আরও প্রায় ৬ মিলিয়ন বা ৬০ লাখ লোককে দারিদ্র্যসীমার নিচে নামিয়ে এনেছে। প্রায় একইসময়ে বাংলাদেশ ও বিশ্বজুড়ে চাল, গম, ডাল, ভোজ্যতেল ইত্যাদি প্রধান খাদ্যের নজিরবিহীন মূল্যবৃদ্ধি, পর্যবেক্ষক বা দারিদ্র্য-সংখ্যাবিদদের হিসেবে বাংলাদেশের আরও অনেক বেশি লোককে দারিদ্র্যসীমার নিচে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু তারপরেও দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী লোকসংখ্যা ৩০ শতাংশে পৌঁছে যাওয়া দারিদ্র্য-বিমোচন প্রয়াসের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের বিপর্যয় হিসেবেই গণ্য হতে পারে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম যে দারিদ্র্য-বিমোচনে সফল হয়নি তার আরও একটি প্রমাণ সর্বশেষ ২০০৫-০৬ শ্রমশক্তি জরিপ থেকেও পাওয়া যায়। এই জরিপ অনুযায়ী বিনা মজুরিতে পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিতের হার ৩.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে মোট শ্রমশক্তির ২১.৭৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আরও যা লক্ষণীয়, ২০০২-০৩ অর্থবছর থেকে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে স্বকর্মে নিয়োজিতের সংখ্যা, অর্থাৎ আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতের সংখ্যা ২.৭২ শতাংশ কমে গেছে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম যদি যথার্থ ভূমিকা পালন করে থাকে তা হলে স্বকর্মে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা কমার পরিবর্তে বাড়াইতো স্বাভাবিক ছিল।

দুই

গত দেড় দশক ধরে এটা শোনা গিয়েছিল যে, অতি শীঘ্রই মাইক্রো ফাইন্যান্স বা ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বা ক্ষুধাকে যাদুঘরে পাঠানো হবে; বাংলাদেশে কেউ আর দরিদ্র থাকবে না; অভুক্ত থাকবে না। বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্র্য কমাবার বদলে তার বিরাট আস্যে আরও বহু লোককে গিলে ফেলেছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ এবং তার প্রায় চার কোটি লোক আজ ক্ষুদ্রঋণের ভারে জর্জরিত। সামান্য কয়েক কোটি টাকা দিয়ে আজ থেকে দু'দশক আগে যে-ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালু হয়েছিল, গরিবের শ্রমে পুষ্ট হয়ে তা বর্তমানে ৭৭ হাজার ৩৮০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে

(অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৯)। গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মকাণ্ডের পরিচিতি দিতে গিয়ে 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৯' লিখেছে, "বিত্তহীন মানুষের হাতে জামানতবিহীন পুঁজি তুলে দিতে পারলে নিজের কর্মসংস্থান সে নিজেই সৃষ্টি করতে পারে। এ ধারণার প্রেক্ষিতে সৃষ্ট গ্রামীণ ব্যাংক কোনো প্রকার জামানত ব্যতীত ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে থাকে। ঋণের টাকা সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধ করা হয় এবং ব্যাংকের যাবতীয় আর্থিক লেনদেন সাপ্তাহিক কেন্দ্র বৈঠকের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।" এ-প্রক্রিয়ায় প্রত্যেক ঋণগ্রহীতার ঋণের জন্য পুরো গোষ্ঠী বা দল দায়ী থাকে। ঋণ পরিশোধের জন্য দলের (Group) ওপর যে-প্রচণ্ড চাপ আসে তা অধিকাংশ সময় ঋণগ্রহীতার জন্য অসহনীয় হয়ে ওঠে। দেখা গেছে, ক্ষুদ্রঋণ বা micro-credit-এর সুদের হার মহাজনী সুদের প্রায় কাছাকাছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ২৫ শতাংশের কম নয়। অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্রঋণ বাংলাদেশের গ্রামে এক ভীতিকর ঋণচক্রের বা Vicious Debt Cycle-এর সৃষ্টি করেছে। কোনো ঋণগ্রহীতা কোনো এক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে যখন সে এই ঋণের সুদ-আসল বা কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হল, তখন সে কিস্তি পরিশোধের জন্য আরেকটি প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে। দু'টি প্রতিষ্ঠানের কিস্তি পরিশোধ যখন দু:সাধ্য হয়ে ওঠে, তখন সে আরও চড়া সুদে তৃতীয় কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে ধরণা দেয়। এইসব ঋণের কিস্তি পরিশোধের জন্য সে ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করে। তার এই পরিশ্রমের ফলের বিরাট একটি অংশ চলে যায় এই ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান বা এনজিওগুলোর কাছে। এইভাবে গ্রামীণ কৃষি, গ্রামীণ কারিগরি, গ্রামীণ পশুপালনে এবং অন্যান্য সেবা খাতে যে-উদ্বৃত্ত সম্পদ বা Surplus Value সৃষ্টি হচ্ছে, তার প্রায় পুরোটাই চলে যাচ্ছে এইসব ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে। এই ঋণ আদায়ের মাত্রা প্রায় ৯৯ শতাংশ হওয়ায় এই ধরনের Micro Finance আজ বাংলাদেশে এক বিরাট ঝুঁকিবিহীন লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। এই ব্যবসায়ের মাধ্যমে কোনো পরিশ্রম না করে বাংলার পরিশ্রমী মানুষগুলোর সৃষ্ট সম্পদের মালিক হয়ে যাওয়া যায় অতি সহজে। এর ফলে বাংলার গ্রামীণ সমাজ আজ ঋণে জর্জরিত।

"গ্রামীণ ব্যাংক ডিসেম্বর, ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ৩৬,৪২০টি গ্রামে ১,০৭৯টি ব্যাংক শাখার মাধ্যমে প্রায় বিশ লাখ ৬০ হাজার ব্যক্তিকে (মহিলা ৯৪%) ৬,৫৫১ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে এবং এই ঋণ সুদসমেত ফেরত প্রদান করার হার ৯৮ শতাংশ। এই সময়ে একইভাবে বাংলাদেশ রুরাল এডভান্সমেন্ট কমিটি বা ব্র্যাকও বিতরণ করেছে ১,৪৭২ কোটি টাকার ঋণ প্রায় ১৮ লাখ ব্যক্তিকে, যাদের মধ্যে ৯২ শতাংশ মহিলা। এদেরও ৯৭ শতাংশ সুদসহ ঋণ পরিশোধ করেছেন। অন্যসব ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থাও কম-বেশি গ্রামীণ ব্যাংকের অনুসৃত পথে বা সদৃশ পথে ঋণদান করছে এবং তা আদায় করছে খুব কঠোর বিধি বিধানের মাধ্যমে" (সেন ১৯৯৯)। দেখা যাচ্ছে, ক্ষুদ্রঋণের এই দুই মহীরূহ সংস্থা ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৩৮ লাখ ৬০ হাজার ব্যক্তিকে ৮,০২৩ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিল। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০০৯) প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী, মাত্র এক দশকের ব্যবধানে এই-দুই প্রতিষ্ঠানই ১,৫৯,৩০৯৫২ জন লোককে ৮০,০১২ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। সেদিনের আট হাজার তেইশ কোটি টাকা যে মাত্র এক দশকের মাথায় আশি হাজার বারো কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, তা ঋণগ্রহীতাদের কিস্তি পরিশোধের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। বস্তুত গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাক-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজ বাংলাদেশের গ্রামে অসংখ্য ক্ষুদ্র-ঋণদাতা সংস্থা তাদের অগণিত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৯-এ অধিকতর পরিচিত দশটি ক্ষুদ্রঋণ-বিতরণ-প্রতিষ্ঠানের (যার মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাক রয়েছে) ঋণগ্রহীতা ও তাদের মধ্যে বিতরণকৃত ঋণের অঙ্কের যে হিসাব দেয়া হয়েছে, তাতে দেখা যায় ৩,৯৩,৫৯,৩৯১ (তিন কোটি তিরানব্বই লক্ষ

উনষাট হাজার তিনশ একানব্বই) জনকে তারা মোট ১,২২,০০০ (এক লাখ বাইশ হাজার কোটি) টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। ক্ষুদ্রঋণ খাতের বড় এই ১০টি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও আরও অসংখ্য মহাজনী সংস্থা বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণকে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করে। আমাদের হিসাব মতে, বর্তমানে বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণের এসব মহাজনী সংস্থার কাছে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পুঞ্জীভূত ঋণ প্রায় দেড় লাখ কোটি টাকা ও চলতি বছরের বহমান ঋণ প্রায় পঁচিশ হাজার কোটি ছাড়িয়ে গেছে আর ঋণগ্রহীতার সংখ্যাও প্রায় পাঁচ কোটি। এনজিও কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষুদ্রঋণের এই ব্যাপক বিস্তৃতির জন্য বিশ্বব্যাংকের সুপারিশও অনেকাংশে দায়ী। ১৯৯৬ সালে বিশ্বব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন-এ জানানো হয়েছিল, "দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিশ্বব্যাংক এনজিও ও সুশীল সমাজের প্রতি সরকারের অধিকতর সুদৃষ্টি দেখতে আগ্রহী। এজন্য তারা বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ায় রাষ্ট্র-এনজিও সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা কার্যক্রমও আরম্ভ করেছে" (Annual Report-1996, World Bank, p.51)।

তিন

"ক্ষুদ্রঋণ যারা গ্রহণ করেন, তারা এ ঋণ ব্যবহার করে হাঁস, মুরগির চাষ বা ছোট দোকান প্রভৃতি খুলে যে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া বা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে অবলম্বন করেন তা হল 'সরল পণ্য-উৎপাদন প্রক্রিয়া' (Simple Commodity Production) 'প্রসারিত পণ্য পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া' (Extended Commodity Reproduction) নয় (সেন ১৯৯৯)। 'সরল পণ্য-উৎপাদন প্রক্রিয়া'য় যে সামান্য উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়, তার প্রায় সবটাই ভোগে এবং পণ্য-উৎপাদন বা আয়ের যে-মাধ্যম রয়েছে, তা সংরক্ষণে চলে যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ছোট একটা মুদির দোকান খুললে তা থেকে পণ্য বিক্রি মারফত মুনাফাসুদ্ধ প্রাপ্ত অর্থের মুনাফা যায় ভোগে এবং আসল যায় আবার পণ্য বা মাল কিনতে। মুনাফা যদি কম হয় বা ভোগের (consumption) দাবি যদি বেশি হয়, ঘরের পোষ্যদের সংখ্যাধিক্য বা বিয়ে, অসুখ প্রভৃতির কারণে, তাহলে আসলও খরচ হয়ে যায়, ফলে সরল পণ্য-উৎপাদন প্রক্রিয়াও চালু রাখা যায়না" (সেন ১৯৯৯)। গাভী পালন, রিক্সা ক্রয়, চিড়ে, মুড়ি বা বেতের কাজ ইত্যাদি ক্ষুদ্রখাতেই মুখ্যত ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের অর্থ বা ঋণ ব্যয় হয়েছে। এইসব খাতের প্রসার ক্ষমতা খুবই সীমিত। তাই ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের যা অর্জন, তা হচ্ছে কিছু দুঃস্থ গ্রামীণ দরিদ্রের প্রচন্ড অসহনীয় মানবেতর জীবনটা কিছুটা সহনীয় করা। বঞ্চিত মানুষগুলোর জন্য এটাও কম প্রাপ্তি নয়। কিন্তু এর মধ্যে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি নিহিত নেই।

হাজার বছর ধরে প্রাক্-পুঁজিবাদী সমাজে সরল পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অধিকাংশ মানুষ তাদের জীবনকে সহনীয় পর্যায়ে প্রবহমান রেখেছে। গত এক দশকের ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে বলা যায়, গ্রামীণ জনগণের জন্য এই প্রকল্প একটি Subsistence Trap ছাড়া আর কিছু নয়। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে যে সেবাখাত বা পণ্য-উৎপাদন প্রবহমান থাকে, তা কখনো বর্ধিত পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্ম দেয় না, সেখানে কখনো কোনো Capital Accumulation বা পুঁজির পুঞ্জিভবন হয় না যেহেতু পুরো উদ্বৃত্তই সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে চলে যায় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কাছে। তাই এই পথে কখনো দেশের সার্বিক দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়; দু'একজনের জন্য তা হঠাৎ করে সম্ভব হলেও।

চার

গত এক দশক ধরে ক্ষুদ্রঋণ প্রক্রিয়ার চলিষ্ণুতা থেকে গ্রাম-বাংলার অধিকাংশ মানুষ কেবল প্রাণ-নির্বাহ-বহমান ফাঁদে বা Subsistence Trap এ-ই নয় একই সঙ্গে ঋণের মরণ-ফাঁদ বা Mortal Debt Trap-এও নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। অথচ মাইক্রো-ক্রেডিট বা ক্ষুদ্রঋণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গ্রামের মানুষ, বিশেষ করে গ্রামের নারীগোষ্ঠী আজ সৃষ্টি করেছে এক বিশাল Informal Sector যার থেকে ঋণগ্রহীতা এবং ঋণগ্রহীতার পরিবারের সদস্যদের জীবনকে সহনীয় পর্যায়ে প্রবহমান রাখার মত আয়ই উপার্জন হচ্ছেনা উপার্জন হচ্ছে উদ্বৃত্তও। কিন্তু এই ফাঁদের মাধ্যমে গ্রামের প্রায় পুরো উদ্বৃত্ত চলে যাচ্ছে এইসব এনজিও বা ঋণদাতাদের কাছে। এর একটা বড় অংশ যদি গ্রামে থাকত, তাহলে তা গ্রামের পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা সম্ভব হতো; গ্রামীণ জনগণের উৎপাদনী-শক্তি বাড়ানো যেত; ভোগের মান ও পরিমাণকে (Quality and Quantity of Consumption) অর্থাৎ ক্যালোরি পরিগ্রহণও বাড়ানো সম্ভব হতো। গ্রামীণ জনগণ যদি সহজ শর্তে স্বল্প সুদে, অর্থাৎ ঋণ প্রদানের যে-ব্যয়, সেই-ব্যয়ের সামান্য-বর্ধিত-হারে পুঁজি পেত তা'হলে তাদের উদ্বৃত্ত হতে সৃষ্ট যে বৃহৎ মূলধন বর্তমানে আমরা মাত্র দশটি বৃহৎ ক্ষুদ্রঋণ-প্রদানকারী-সংস্থার হাতে পুঞ্জীভূত হতে দেখেছি, তা হতো না। সরল উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হলেও গ্রামের সম্পদ বা পুঁজি বৃদ্ধিতে এই উদ্বৃত্ত সহায়ক হতো। গ্রামীণ জনগণের বেশ একটা বড় অংশই দারিদ্র্যসীমার নিচে থেকে ওপরে উঠে আসতে পারত।

মাইক্রো-ক্রেডিট বা ক্ষুদ্রঋণ প্রক্রিয়া গ্রামে আজ যে বিশাল Informal Sector-এর জন্ম দিয়েছে তা যদি রাষ্ট্র কর্তৃক ক্ষুদ্র-পুঁজি প্রবাহের মাধ্যমে ঘটত, তাহলে গ্রামের মানুষ এইরকম ঋণভারে জর্জরিত হতো না এবং দুর্বৃত্তায়িত যে গ্রামীণ সমাজ আজ আমরা দেখছি, তার সৃষ্টি হতো না। চীন, ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ, সাহায্য বা পুঁজি-প্রবাহ গ্রামীণ সমাজকে নবজীবনে উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করেছে। এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, পাঞ্জাব এবং অন্যান্য প্রদেশের কৃষি, গ্রামীণ-কারিগরি, গ্রামীণ শিল্প এবং informal sector-এ যে-প্রবৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে, তা হয়েছে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় যোজনার মাধ্যমে, যেমন-ইন্দিরা যোজনা। এইসব যোজনার মাধ্যমে রাষ্ট্র গ্রামীণ জনগণকে ক্ষুদ্রঋণ বা ক্ষুদ্রপুঁজি সরবরাহ করছে স্থানীয় সরকার বা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে, (যেমন হয়েছে সমাজতান্ত্রিক চীন ও ভিয়েতনামে)। অতি স্বল্প সুদে অর্থাৎ ঋণ-প্রদানের ব্যয় মিটিয়ে রাষ্ট্র নিজেই স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণকে পুঁজি (ক্ষুদ্র ঋণ) বা অর্থ দিয়েছে বিভিন্ন খাতে কর্ম সৃষ্টি এবং কর্মপ্রবাহ বৃদ্ধি করার জন্য। এইসব দেশে বিশেষত চীন, ভিয়েতনাম, কেরালার গ্রামীণ জনগণ দারিদ্র্য-বিমোচনের ক্ষেত্রে যে বহুদূর এগিয়ে গেছে তার অন্যতম মুখ্য কারণ হলো সেখানে গ্রামীণ দারিদ্র্য-বিমোচনে সরকারই মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

আজ বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ (ঋণগ্রহীতার পরিবারসহ হিসেব করলে দুই-তৃতীয়াংশই) যে বিশাল ঋণভারে জর্জরিত তার দায়ভার নিতে হবে রাষ্ট্রকে, অর্থাৎ জনগণের দ্বারা ক্ষমতায়িত সরকারকেই। এই দায়ভার নিতে রাষ্ট্র যদি অস্বীকৃতি জানায়, তা'হলে জনগণের কল্যাণ করার রাষ্ট্রের যে নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে সেই দায়িত্বকেই অস্বীকার করা হবে। আজ থেকে কয়েক দশক আগে শেরে বাংলা ফজলুল হক ঋণ-সালিশী বোর্ডের মাধ্যমে গ্রাম বাংলার কৃষক সমাজকে ঋণমুক্ত করার যে কর্মসূচি নিয়েছিলেন, সে রকম সাহসী ও প্রাজ্ঞ কর্মসূচি আজ রাষ্ট্রকে নিতে হবে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর যে বিরাট অংশ ঋণ-পরিশোধে অক্ষম, আইন প্রণয়ন করে তাদের ঋণমুক্ত ঘোষণা করার উদ্যোগ নিতে হবে। মনে রাখতে হবে, এই ঋণের পরিমাণ ন্যূনপক্ষে প্রায় পঁচিশ হাজার কোটি টাকা (মাথাপিছু প্রায় পাঁচ হাজার হিসাবে)। তাছাড়া বৃহৎ ক্ষুদ্রঋণ-সংস্থাগুলির হাতে যে বিশাল পুঁজি (প্রায় দেড় লাখ কোটি

টাকা) সঞ্চিত হয়েছে, এই বৃহৎ সংস্থাগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলে, সেই পুঁজিই গ্রামীণ কৃষি-শিল্প-সেবা ও অনানুষ্ঠানিক খাতের এবং গ্রামীণ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য অত্যন্ড় প্রয়োজনীয় পুঁজির সবচেয়ে বড় উৎস হতে পারে। অতি স্বল্প সুদে এই পুঁজির বণ্টনভার স্থানীয় সরকারের উপর ন্যস্ড় করা যায়। কোনো অঞ্চলে কোনো স্থানীয় সরকার তাদের দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে বা দুর্নীতির আশ্রয় নিলে স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুরো গ্রাম বা অঞ্চল তাদের বির"দ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে। গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণে স্থানীয় সরকারের কোনো বিকল্প নেই (বিশ্ব ইতিহাসে ষোড়শ শতকে রাণী এলিজাবেথের সময় ইংল্যান্ডে প্রবর্তিত Poor Law এইক্ষেত্রে একটি উদাহরণ হয়ে আছে। ইংল্যান্ডে সে সময় Enclosure Movement শুর" হওয়ায়, সামন্ড়রা নিজেদের জমি ভেড়া চাষের জন্য নিয়ে নেওয়ায়, অসংখ্য কৃষক জমি থেকে উৎখাত হয়েছিল। ফলে গ্রামাঞ্চলে যে-ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য সৃষ্টি হয়েছিল, Poor Law'র মাধ্যমে তা নিরসনের চেষ্টা করা হয়। স্থানীয় সরকারের উপরই এই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। এই Poor Law'কেই বিশ্ব ইতিহাসের প্রথম সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা বা Social Security System হিসেবে অভিহিত করা চলে)।

পাঁচ

বাংলাদেশ গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করে দরিদ্রদের ভার কিছু অংশে গ্রহণ করেছে। দেখা গেছে, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত ভিজিএফ, ভিজিডি, টি-আর, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, প্রসূতি ভাতা ইত্যাদি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প দারিদ্র্য লাঘবে অনেক সহায়ক হয়েছে। এই সমস্ড় খয়রাতি প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে দারিদ্র্য লাঘব সম্ভব, কিন্তু দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। দারিদ্র্য বিমোচন করার জন্য প্রয়োজন কর্ম সৃষ্টি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি। এই মুহূর্তে বিশ্বজুড়ে খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেভাবে হুমকির সম্মুখীন, তা থেকে বাংলাদেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে মুক্তি দিতে হলে কেবল ভিজিএফ, ভিজিডি ইত্যাদি কার্ড বিতরণ করলেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার। এই লক্ষ্যে ক্ষুদ্র চাষী, মাঝারি চাষী ও বর্গা চাষীদের কৃষি-ব্যয়ভার যেমন, সেচের জন্য জ্বালানি ব্যয়, সার, বীজের খরচ ইত্যাদির জন্য রাষ্ট্রকে বৃহৎ অংকের পুঁজি সরবরাহ করতে হবে, কৃষককে ঋণমুক্ত রাখতে হবে। আজ থেকে কয়েকশো বছর আগেই ধ্র"পদী অর্থনীতিবিদরা বলেছিলেন, প্রতিটি ব্যক্তির জীবন-মান (Quality of Life) উন্নয়নের জন্য পুঁজির প্রয়োজন এবং সমাজের পুঁজিতে প্রত্যেক নাগরিকেরই অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার অবশ্য ইতোমধ্যেই দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মাধ্যমে সহজ শর্তে কৃষককে ঋণ সরবরাহ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তাছাড়া জ্বালানি, বীজ, সার ইত্যাদির সময়মতো সরবরাহ ও প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্যও সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছ। বাংলাদেশের সদ্য-ঘোষিত বাজেটে কৃষিখাতকে জোর দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষিখাত দুর্বল নয়। যেখানে বিশ্বের মাত্র ১১ শতাংশ জমি চাষযোগ্য সেখানে বাংলাদেশের জমির প্রায় ৯০ শতাংশই চাষযোগ্য যদিও জনসংখ্যার চাপে প্রতিবছর এক শতাংশ হারে কৃষিজমি অন্যখাতে চলে যাচ্ছে। বাংলাদেশে জমি অত্যন্ড় উর্বর, কিন্তু কৃষিজমির একর প্রতি ফলন এখনও অনেক কম। অনায়াসেই ফলন বাড়ানোর বিরাট অবকাশ রয়েছে। কারণ, বাংলাদেশের কৃষিজমিকে অনায়াসে দুই ফসলী অথবা তিন ফসলীতে রূপান্ড়র করা সম্ভব, যা বিশ্বের বহু দেশে সম্ভব নয়। বাংলাদেশে জমির পরিমাণ বিশ্বভূমির মাত্র .০২ শতাংশ কিন্তু বিশ্বের সাড়ে ছয় শতাংশ মিঠা পানি বৃষ্টি ও নদীপ্রবাহের আকারে বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়; এরও কোনো সুফল আমরা এখনো

ধরতে পারিনি। এর প্রধান কারণই হলো বাংলাদেশে বড় কৃষক যারা এই সুবিধাগুলোর সুযোগ গ্রহণ করার জন্য বিনিয়োগ করতে সক্ষম তাদের অভাব রয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই হল প্রান্ডিক কৃষক ও ক্ষুদ্র কৃষক। সাড়ে সাত একরের উপর জমি আছে এরকম কৃষকের সংখ্যা খুবই কম। সুতরাং মাঝারি, ক্ষুদ্র ও প্রান্ডিক কৃষককে পুঁজি যুগিয়েই বাংলাদেশের খাদ্য-নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং সেটা মোটেই অসাধ্য কোনো কাজ নয়।

তবে কেবল কৃষিখাতেই নয়, গ্রামীণ অর্থনীতির অন্যান্য খাতেও পুঁজি প্রবাহ জর"রি। বাংলাদেশের গ্রামে আজ যেভাবে জনসংখ্যা বেড়ে গেছে, বহুদিন আগে থেকেই কৃষির পক্ষে তা বহন করা সম্ভব হচ্ছিল না। কৃষির বর্ধিত জনগণকে ক্রমবর্ধমান শিল্প ও সেবাখাতে নিয়ে এসে তাদের জীবনমান বৃদ্ধি করতে হবে। এই লক্ষ্যে গ্রামীণ কারিগরি খাত, গ্রামীণ শিল্পখাত, গ্রামীণ সেবাখাত ইত্যাদি খাতে রাষ্ট্র কর্তৃক পুঁজি সরবরাহ করে কৃষির বর্ধিত জনগণকে আত্মকর্ম গ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। বস্তুত আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রকেই সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে, এনজিও'কে নয়।

মাইক্রো-ক্রেডিট বা ক্ষুদ্রঋণের সহায়তা গ্রহণ করে বাংলাদেশের নারীগোষ্ঠী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের যে জগত সৃষ্টি করেছেন তা থেকে প্রকাশ পাচ্ছে গ্রামীণ নারীর মধ্যে ব্যবসায়ের ঝুঁকি গ্রহণ করার বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনাকে ব্যাপক আকারে স্ফুরিত করার জন্য নারীকে সহজ এবং স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা জর"রি। রাষ্ট্রকেই এই দায়িত্ব নিতে হবে। কেননা সম্পত্তিতে অধিকার না থাকার কারণে নারী উদ্যোক্তারা ঋণ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় Collateral দিতে পারেন না। দারিদ্র্য বিমোচনের উপর নারী-সৃষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বহুমাত্রিক ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। তাছাড়া সহজাতভাবে নারীর সঞ্চয় প্রবণতা (propensity to save) উচ্চ হওয়ায় অধিকতর লাভজনক ব্যবসা (যা সম্ভব হবে সহজ ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তির কারণে) হতে অধিকতর সঞ্চয় হবে যা পুনর্বিনিয়োগ করে নারীগোষ্ঠী তাদের ব্যবসাকে উত্তরোত্তর আরও লাভজনক করতে পারবেন এবং সেইসঙ্গে দারিদ্র্য বিমোচনেও তারা অধিক থেকে অধিকতর অবদান রাখতে পারবেন। তাই নারীকে ঋণ প্রদানের জন্য রাষ্ট্রকেই সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে, এনজিও'কে নয়।

ছয়

রাষ্ট্রের এই প্রচেষ্টা অবশ্য সফল হবে না যদি গ্রামীণ বাংলার জনগণকে প্রতিবছর প্রায় পঁচিশ হাজার কোটি টাকার ঋণ-পরিশোধের দায়ভার থেকে মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা না হয়। মনে রাখা প্রয়োজন, এই পঁচিশ হাজার কোটি টাকার মধ্যে রয়েছে প্রায় ছ'হাজার কোটি টাকা সুদ (২৫ শতাংশ হারে); পাঁচ কোটি লোকের মাথাপিছু বার্ষিক প্রায় বারশ টাকা সুদ। গ্রামীণ মানষের সৃষ্ট এই বিশাল উদ্বৃত্ত যদি পুনর"ৎপাদনে সে নিজেই প্রয়োগ বা ব্যবহার করতে পারতো, তাহলে বাংলার গ্রামের চেহারা চীনের বা ভারতের কেরালা বা হরিয়ানা থেকে খুব বেশি পেছনে থাকতো না। গ্রাম-বাংলা কেবল যে নিজেকেই সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হতো তা-ই নয়, দেশের শিল্পায়নের জন্য কিছুটা হলেও উদ্বৃত্ত বা পুঁজির যোগান বাড়াতে পারতো, দেশের সার্বিক পুঁজি সঞ্চয়নে বা Capital Accumulation-এ ভূমিকা রাখতে পারতো। গ্রাম-বাংলার প্রাণশক্তিকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাই আজ রাষ্ট্রকেই উদ্যোগ নিতে হবে; গ্রামে সহজ ও স্বল্প সুদে পুঁজি-প্রবাহ বৃদ্ধি করে গ্রামের সার্বিক উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সঞ্জীবিত করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

সেন, অনুপম (১৯৯৯)ঃ "বাংলাদেশ : রাষ্ট্র ও সমাজ," পৃষ্ঠা ১০৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, জানুয়ারি।
অর্থ মন্ত্রণালয় (২০০৯)ঃ "বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৯," অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
World Bank: *Annual Report 1996*.